ভারত-আসিয়ান এবং ২৫”

Atanu gupta
research scholar
Email: atanugupta2014@gmail.com

প্রাককথন:

২৬ শে জানুয়ারি ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস। পরাধীন ভারতে ১৯৪৬ -র ৯ ডিসেম্বর ভবিষ্যতে স্বাধীন হতে চলা ভারত কে পরিচালনা করার জন্য যে 'অশ্বমেধ যজ্ঞের' সূচনা হয়েছিল, তা ফলপ্রদান করল ১৯৫০ -র ২৬ শে জানুয়ারি। অর্থাৎ স্বাধীন ভারতের সংবিধান কার্যকর হল। আর এই যজ্ঞে শেষ পূর্ণাহুতি দেওয়া হয়েছিল ১৯৪৯ -র ২৬ শে নভেম্বর। এতো কথার কারণ একটাই। সেই ১৯৫০ থেকে প্রতি বছরই প্রজাতন্ত্র দিবসের সময় ভারতে বিশ্বের কোন না কোন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান মুখ্য আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে আসেন। কিন্তু ২০১৮ সে ক্ষেত্রে এক অনন্য উদাহরণ রচনা করল। এ বছর ৬৯ তম সাধারণতন্ত্র দিবসে ভারতে আসিয়ান [ASEAN / Association of South-East Asian Nations] গোষ্ঠীর সদস্য ভুক্ত দশটি দেশেরই রাষ্ট্রপ্রধানরা মুখ্য আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে একসঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। উদ্দেশ্য দিল্লিতে 'ভারত - আসিয়ান শিখর সম্মেলনে' [Commemorative Summit] অংশগ্রহণ। যা ভারতের পক্ষে সত্যি এক ঐতিহাসিক ঘটনা। যার চিত্রনাট্য হয়তো লেখা শুরু হয়েছিল গত বছর, ২০১৭-র নভেম্বর মাসে। যখন তিনদিনের সফরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ফিলিপিনস যান।উদ্দেশ্য একত্রিশ তম আসিয়ান সম্মেলন এবং দ্বাদশ পূর্ব এশিয়া সম্মেলনে অশংগ্রহণ করা। কারণ মনে রাখতে হবে, এই ২০১৭ 'ভারত-আসিয়ান' মৈত্রী সম্পর্কের রজতজয়ন্তী বর্ষ। আর যে চিত্রনাট্যের রচনা সেখানে শুরু হয়েছিল, তা সফল ভাবে মঞ্চস্থ হল জানুয়ারি মাসে দিল্লিতে। এবং এই প্রেক্ষিতেই সাম্প্রতিক কালে 'ভারত-আসিয়ান' সম্পর্কটা ঠিক কোন স্তরে পৌঁছেছে সেটাকেই এখানে তথ্য ও পরিসংখ্যান, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের সাহায্যে তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে। যেখানে পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও পরিস্থিতির দাবিকে মাথায় রেখে চিন ও দক্ষিণ এশিয়ার আলোচনাও অবশ্যই উঠে এসেছে প্রাসঙ্গিক ভাবে। এখানে প্রধানত দুটো বিষয়ের উপর আলোকপাত করার চেষ্টা হবে।

এক, ভারত ও আসিয়ান একে অপরের কাছে আজকের দিনে কেন এতো গুরুত্বপূর্ণ?

দুই, ভারত-আসিয়ান পারস্পরিক নির্ভরশীলতার সাম্প্রতিক গতিপ্রকৃতি।

প্রেক্ষাপট:

১৯৮৯-৯০, সমগ্র বিশ্ব জুড়ে 'উদারীকরণ-বেসরকারিকরণ-বিশ্বায়নের' যুগ শুরু হল। এই 'ত্রি-শক্তি' র নেক নজরনজরকে এড়িয়ে যাওয়া কোন দেশের পক্ষেই সম্ভব হয়নি। ১৯৯১, ভারতের নবম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এক তেলেগু ব্রাহ্মণ, পামুলাপারটি ভেঙ্কটা নরসিমহা রাও শুরু করলেন তাঁর কার্যকাল। তাঁর আমলেই এই 'ত্রি-শক্তি' স্ব-দলবলে ভারতে প্রবেশ করে। অর্থনীতির সঙ্গে সঙ্গে বিদেশ নীতির ক্ষেত্রেও তিনি বেশ কিছু নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এলেন। তিনিই প্রথম সরকারি ভাবে ইস্রায়েলে ভারতের দূতাবাস স্থাপন করলেন। একই সাথে গ্রহণ করলেন 'Look East Policy' বা পূর্বে তাকাও নীতি। সেই দূরদৃষ্টি সম্পন্ন চিন্তা শক্তির সুফলই ভারত ও আসিয়ানের সম্পর্কে আজ এই উচ্চ-গ্রামে প্রতিষ্ঠিত করেছে। "এই দীর্ঘ ২৫ বছরের যাত্রাপথে উভয় পক্ষকেই বিভিন্ন চড়াই-উতরাই অতিক্রম করতে হয়েছে। পারস্পরিক আদান-প্রদানের সম্পর্ক পারস্পরিক নির্ভরশীলতায় রূপান্তরিত হয়েছে। এই দীর্ঘ সময়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ ইতিহাস আজ কালের গর্ভে প্রমাণ হিসেবে সঞ্চিত আছে" [২৫.১.২০১৮, রাজ্যসভা টিভির 'দেশ দেশান্তর, নামক অনুষ্ঠানে প্রাক্তন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত, বিবেক কাটজু এই মত ব্যক্ত করেন] ।

১৯৯২ সালে রাও যে Look East Policy [LEP] কে গ্রহণ করেন, ২০১৪ তে এসে সদ্য নিযুক্ত বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তার রূপান্তর ঘটিয়ে ডাক দিলেন ' Act East Policy'-র। অর্থাৎ একটা বড় সময় ধরে কথাবার্তা, আলাপ-আলোচনার পর্ব গেছে। " ... সে সময় অতিক্রান্ত। এখন কাজের সময়, কাজ করতে হবে। প্রকল্প গুলোর বাস্তবায়ন হল মূল লক্ষ্য। ... এটা সময়ের দাবি, উভয় পক্ষের দাবি, সর্বোপরি উভয় পক্ষের রাষ্ট্রগুলোর আপামর জনসাধারণের দাবি" [২০১৪, আসিয়ান সম্মেলনে দেওয়া প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভাষণের সারাংশ বিশেষ] ।
আসিয়ান, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া তথা পৃথিবীর এক সফল আঞ্চলিক গোষ্ঠী, যেখানে দশটি রাষ্ট্রের সমাহার এবং মোট জনসংখ্যা ৬৪ কোটি। যদি একে একটা স্বতন্ত্র দেশ হিসেবে ধরা হয়, তাহলে সমগ্র অঞ্চলটার স্থলভাগের ক্ষেত্রফল ৪.৪ মিলিয়ন স্কোয়ার কিলোমিটার যা পৃথিবীর সমস্ত ভূ-ভাগের তিন শতাংশ। দশটি দেশের সম্মিলিত জি ডি পি ২০১৫-র হিসেব অনুযায়ী ২.৮ ট্রিলিয়ান ডলার [তথ্যটা উইকিপিডিয়া থেকে সংগৃহীত] । ২০১৮ পর্যন্ত পৃথিবীতে শীর্ষে থাকা পনেরোটা ম্যানুফ্যাকচারিং কেন্দ্র গুলোর মধ্যে পাঁচটা আসিয়ানে অবস্থিত।

ভারত ও আসিয়ান একে অপরের কাছে কেন এতো গুরুত্বপূর্ণ:

এই বিষয়টা কেবল উক্ত দু'পক্ষের মধ্যে সীমিত নয়, বরং দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ার সাম্প্রতিক রাজনৈতিক গতি-প্রকৃতিও এর সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। কারণ এই আসিয়ান সম্মেলন যে সময় পর্বে অনুষ্ঠিত হল তার প্রেক্ষাপট হিসেবে পাঁচটা জ্বলন্ত সমস্যা উঠে এসেছে, যেমন - ১) চিনের আর্থিক ও সামরিক হঠকারিতা, ২) উত্তর কোরিয়া সংক্রান্ত পরমাণু বিবাদ, ৩) দক্ষিণ চিন সাগরের বিবাদ, ৪) এই সমগ্র অঞ্চলে আই এস আই এস ও সন্ত্রাসবাদের প্রভাব বিস্তার, ৫) ভারত মহাসাগরে বিভিন্ন মাল পরিবহণকারী জাহাজ ও রণতরীর নিরাপত্তা সংক্রান্ত দুশ্চিন্তা।
১৯৬৭ সালের অগাস্ট মাসে থাইল্যাণ্ডের রাজধানী ব্যাংকক-এ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পাঁচটি রাষ্ট্রের উদ্যোগে প্রথম আসিয়ান গঠিত হলেও এর প্রথম শীর্ষ সম্মেলন হয় ১৯৭৬-এ গিয়ে। আরো ষোলো বছর পর, ১৯৯২ সালে এসে প্রথম সরকারি ভাবে পুরোমাত্রায় আসিয়ানের দিকে ঝুঁকতে শুরু করে ভারত। নরসিমহা রাও-র LEP-র প্রথম সফল পদক্ষেপ হিসেবে ভারত ঐ বছরই আসিয়ানের Sectoral Dialogue Partner হল। ২০০২ তে Summit Level Partner, ২০১২ তে Strategic Partner. ২০১৫, ভারত উভয়ের সম্পর্ককে আরো গভীর ও দৃঢ়বদ্ধ ভাবে গড়ে তোলার জন্য আসিয়ানে বিশেষ রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করল। আসলে ভারত কেবল আসিয়ান পর্যন্ত সীমিত নেই, সে নিজেকে BIMSTEC [The Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation] থেকে শুরু করে পূর্ব এশিয়া পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে।

ভারত একটি অন্যতম উন্নয়নশীল রাষ্ট্র হলেও পৃথিবীর এক বিশাল বাজার হিসেবেও পরিগণিত। তার অর্থব্যবস্থাও ক্রমেই সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে ভারতও নতুন নতুন বাজার খুঁজছে, বিভিন্ন পণ্য উৎপাদনের জন্য যাতে সহজে কাঁচামাল সংগ্রহ করা যায়। কারণ, আমাদের একটা প্রধান উদ্দেশ্য হল নিজেদেরকে এক উন্নত ও দক্ষ ম্যানুফ্যাকচারিং হাব হিসেবে গড়ে তোলা। এই প্রেক্ষিতে ক্যাপ্টেন আলোক বনসলের মতামতকে তুলে ধরা যেতে পারে। ১৫.১১.২০১৭, লোকসভা টিভির 'লোকমঞ্চ' নামক অনুষ্ঠানে এই অভিমত ক্যাপ্টেন বনসল ব্যক্ত করেন। দুর্ভাগ্য বশত আমাদের পশ্চিমদিকের সীমান্তে এমন একটা রাষ্ট্র আছে যে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমাদেরকে কোন ভাবেই যাওয়ার জন্য রাস্তা দিতে রাজি নয়। তা আফগানিস্তান হোক বা মধ্য এশিয়া বা সুদূর পশ্চিম এশিয়া হোক। উত্তরে চিনের সঙ্গে হাজারো সমস্যা। তাই বাস্তবিক ভাবেই বর্তমান সময়ে আমাদের কাছে একটাই দিক বা দিশা আছে। সেটা হল পূর্বের দিকে তাকানো। অনেকদিন ধরেই LEP -র কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু একটা শক্তিশালী দৃঢ় পদক্ষেপ এতোদিনে নেওয়া হয়েছে।

দক্ষিণ চিন সাগরে বিবাদ:

এই প্রেক্ষিতেই 'দক্ষিণ চিন সাগর' বিবাদের বিষয়টা বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে ভারত ও আসিয়ান কে পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল করে তুলতে। দক্ষিণ চিন সাগর অঞ্চলটি সমগ্র বিশ্বে, যে কটা প্রধান সামুদ্রিক বাণিজ্যের ও যোগাযোগের পথ [corridor] রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম। বিশ্ব মানচিত্রের দিকে তাকালে দেখা যাবে, এই অঞ্চলটার চারপাশে আসিয়ান ভুক্ত দেশসমূহ, বিশেষ করে চিন এবং পূর্ব এশিয়ার বাকি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রগুলো [জাপান, উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া, এবং দূরবর্তী অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত] এমন ভাবে অবস্থান করছে যে প্রত্যেকেই এই অঞ্চলটার উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় ভাবে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। ফলে এর গুরুত্ব এতটাই বিশাল যে একে কোন ভাবেই খাটো তো দূরের কথা, অস্বীকার করারই কোন উপায় নেই। উল্লেখ্য, ভারত যার অবস্থান ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে হলেও [ভারত মহাসাগরের নামকরণ হয়েছে ভারত রাষ্ট্রের নামকে অনুসরণ করে] এর উপর সেও চূড়ান্ত ভাবে নির্ভরশীল। এবার এই সামুদ্রিক অঞ্চলটার গুরুত্বের দিকে একবার তাকানো যাক। এই রাস্তার উপর দিয়ে প্রতি বছর প্রায় ৫ লাখ কোটি ডলারের বৈদেশিক বাণিজ্য হয়। দুনিয়ার গুরুত্বপূর্ণ অর্থব্যবস্থা গুলো এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর সরাসরি প্রভাব বিস্তার করে। ভারতীয় অর্থব্যবস্থাও যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। দুনিয়ার প্রায় ৪০ শতাংশ বৈদেশিক বাণিজ্য এই South China Sea Corridor -র উপর দিয়ে হয়। আসিয়ান ভুক্ত দেশ গুলোর কথা যদি বাদও দি তাহলেও দেখা যাবে, দক্ষিণ কোরিয়ার প্রয়োজনীয় শক্তির ২/৩ ভাগ এবং জাপানের প্রয়োজনীয় শক্তির ৬০ শতাংশ এই রাস্তার উপর দিয়ে আসে। অস্ট্রেলিয়ার রপ্তানি বাণিজ্যের ৮০ শতাংশ এই অঞ্চলের মাধ্যমে হয়।৬ চিনের তেল আমদানির একটা বিশাল বড় অংশ আসে এই পথ ধরে। আবার চিনের মুখ্য খনিজ তেল উৎপাদক খনি এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের ভাণ্ডার গুলো কিন্তু এই অঞ্চলেই অবস্থিত।

কিন্তু বিগত আট বা ন' বছরের বেশি সময় ধরে চিন প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে এই অঞ্চলটার উপর নিজের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব বা আধিপত্য [hegemony] কায়েম করতে চাইছে। বলা উচিত নিজের 'পেশী শক্তির' জোর খাটাতে চাইছে। চিন কৃত্রিম উপায়ে দ্বীপ তৈরি করেছে। নিজের রণতরী নিয়োগ করেছে, যাতে একপ্রকার indirectly blocked করে দেওয়া যায়। সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করেছে। যেখানে একাধারে অস্ত্র মজুত করা হচ্ছে এবং সমানতালে অস্ত্রের পরীক্ষাও চলছে। বিতর্কিত এলাকা স্প্র্যাটলি দ্বীপপুঞ্জের ফায়ারি ক্রস রিফে রকেট লঞ্চার ডিফেন্স সিস্টেম মোতায়েন করেছে বেজিং। দক্ষিণ চিন সাগরকে ঘিরে যতগুলো দেশ রয়েছে, তাদের প্রায় সবার সঙ্গেই জলসীমা নিয়ে বিরোধ রয়েছে চিনের। স্প্র্যাটলি দ্বীপপুঞ্জ এবং প্যারাসেল দ্বীপপুঞ্জ কোন দেশের জলসীমায় পড়ছে, বিরোধ বেশি তা নিয়েই। ১৯৮২-র United Nations Convention on the Law of the Sea [UNCLOS] -র নিয়মকে এক্ষেত্রে সরাসরি উল্লঙ্ঘন করেছে বেজিং। বিষয়টা রাষ্ট্রপুঞ্জে উঠলেও বেজিং একে গুরুত্ব দিতে নারাজ। যেমন, আন্তর্জাতিক আদালত জানিয়েছে, স্প্র্যাটলি বা প্যারাসেল আসলে কোনও দ্বীপ নয়, সেগুলো সমুদ্রের মাঝে জেগে থাকা পাথুরে অঞ্চল বা প্রাচীর। ওই অঞ্চলকে চিন নিজেদের জলসীমা বলে দাবি করতে পারে না।৭ কিন্তু আন্তর্জাতিক আদালতের এই রায়ের অনেক আগেই ওই সব এলাকায় দ্রুত গতিতে কৃত্রিম দ্বীপ বানিয়ে ফেলেছিল বেজিং [বাংলা পত্রিকা 'যোজনা', জুন সংখ্যা, ২০১৭] ।
অন্যদিকে, জাপান এবিষয়ে চিনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য এই অঞ্চলের চিন বিরোধী অন্যান্য দেশগুলোর সঙ্গে এক ধরনের জোট গড়ে তুলতে সচেষ্ট। ঐতিহাসিক কারণে দীর্ঘ সময় ধরে চিন ও জাপানের মধ্যে আস্থাহীন সম্পর্ক বিদ্যমান, যদিও বা উভয়ের মধ্যে বাণিজ্য হয়। উত্তর কোরিয়া চিনের ছত্রছায়ায় পরিপুষ্ট, নিজেকে পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্র রূপে গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর। এর বিরুদ্ধে আবার সন্ত্রস্ত দক্ষিণ কোরিয়া। সে উত্তর কোরিয়া ও চিনের আগ্রাসনের হাত থেকে বাঁচতে চায় [সম্প্রতি অবশ্য, দুই কোরিয়ান রাষ্ট্রের মধ্যে দীর্ঘ ছ'দশক পর প্রশাসনিক স্তরে পারস্পরিক বার্তালাপ হয়েছে।

যেহেতু দক্ষিণ চিন সাগরের একটা বড় অংশ জুড়ে আসিয়ান রাষ্ট্র গুলোর অবস্থান তাই তাদের সঙ্গেও জলসীমা নিয়ে চিনের বিরোধ ভালো মাত্রায় পৌঁছেছে। একটা বড় সময় ধরে এই দেশগুলোতে চিন আর্থিক ও পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজে বিনিয়োগ করেছে। ফলে সেখানকার অভ্যন্তরীণ সমাজ ও পরিবেশের উপর চিনের একটা প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। একটা সময়ের এই সাহায্যকে অস্বীকার করা হয় না। কিন্তু এখন তাদের মধ্যে চিন্তা ও একই সঙ্গে ভয়, কারণ, চিন যেহেতু এই অঞ্চলে নিজের কর্মকাণ্ডের দ্বারা একছত্র আধিপত্য কায়েম করতে চাইছে, তার জেরে তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিপদের সম্মুখীন হবে না তো? "বিগত চারশো বছর ধরে, বিশেষত ব্রিটেন ভিত্তিক ইউরোপ বিশ্বজুড়ে যে কায়দায় সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল এবং তারপরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজের আধিপত্য গড়ে তুলতে সচেষ্ট ছিল [বলা চলে তাদের প্রতি আমাদেরকে অনুগত করে রাখতে চেয়েছিল] , এই একুশ শতকে ঠিক সেই একই কায়দায় ও নীতিগত কৌশলকে অবলম্বন এবং অনুসরণ করছে চিন"। যেন ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে চাইছে সে। অনেকটা "জোর যার মুলুক তার"।

অন্যদিকে, আমরা জানি যে, ভারতের স্বার্থও এই অঞ্চলের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত। সেও কোন ভাবেই নিজের আর্থিক বা বাণিজ্যিক বা নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ের হানি ঘটাতে চায় না। কোন দেশই চাইবে না। প্রত্যেক রাষ্ট্রই আগে নিজের স্বার্থ দেখবে। নিজের নিরাপত্তার দিকটাকে সুরক্ষিত করতে চাইবে এবং এটাই রাষ্ট্রধর্ম। মার্কিন বা চিন বা রাশিয়ার সরকারেরা যা করে আসিয়ান বা ভারতও ঠিক সেই একই ধর্ম পালন করতে চাইছে। তাই ভারতের প্রেক্ষিতে বলতে হয়, ভারত থেকে যে সব দ্রব্য সামুদ্রিক পথ দিয়ে বাণিজ্যের সামগ্রী হিসেবে যায়, তার ২৫ শতাংশ এই অঞ্চলের উপর দিয়ে যাচ্ছে। ভারত তার মোট সমুদ্রজাত খাদ্যের [Sea foods] একটা ভালো পরিমাণ অংশ এই করিডোরের মাধ্যমে জাপানে পাঠায়। ভারতের মোট রপ্তানি বাণিজ্যের মধ্যে আসিয়ানের অংশ বর্তমানে ১১.২৪ শতাংশের একটু বেশি। উভয়ের মধ্যে সামুদ্রিক বাণিজ্যের করিডোর এটাই। তা ছাড়া, ভারতের মোট বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রায় ৫০ শতাংশের বেশি এই পথের উপর দিয়ে হয়।৯ মনে রাখা দরকার, এই অঞ্চলে সামুদ্রিক খনিজসম্পদ, জীবসম্পদ ও প্রাকৃতিকসম্পদ-র এক অমূল্য রত্ন ভাণ্ডার রয়েছে। ফলে আর্থিক ও ভৌগোলিক দিক দিয়ে এলাকাটির স্বতন্ত্র বিশেষত্ব আছে। এছাড়া জৈব প্রাকৃতিক গ্যাস ও খনিজ তেলের বিশাল ভাণ্ডার পাওয়া গেছে। আসিয়ান, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, অন্যান্য পূর্ব এশিয়ার দেশ সমূহ এবং ভারত সহ আরো বহু দেশেরই প্রধান অভিযোগ, চিন এখানকার সম্পদের উপর একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করতে উদগ্রীব। যা অযৌক্তিক ও অনৈতিক। স্থানীয় বিভিন্ন রাষ্ট্রকে এই সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাধা দিচ্ছে, তাদেরকে বঞ্চিত করতে চাইছে। এক্ষেত্রে ভারত, জাপান সহ আসিয়ান দেশগুলোর পক্ষে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু, তাঁর এছাড়াও আরো চিন্তার বিষয় আছে, freedom of navigation -কে নিয়ে। কারণ চিন যে ভাবে এই অঞ্চলে তার নৌসেনা'কে নিয়ে এসেছে তা খুব একটা সুখকর নয়। এই পথ দিয়ে যদি আমদানি বা রপ্তানির কাজ বাধা পায়, তাহলে ভারতের পক্ষে তা অত্যন্ত দুশ্চিন্তার বিষয়। ভারতের পক্ষে দ্রুত আমদানি বা রপ্তানি করার ক্ষেত্রে দাম কয়েকগুণ বেশি পড়ে যাবে। ভারতের বাণিজ্যিক জাহাজ গুলোর মুক্ত ভাবে চলাচলের ক্ষেত্রে বিপদ দেখা দেবে। জাহাজ গুলোর সুরক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আঞ্চলিক নিরাপত্তার বিষয়টাও যেখানে ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত। তা ছাড়া, এখানকার তেলের খনি ও প্রাকৃতিক গ্যাস আহোরণের কাজে স্থানীয় দেশ গুলোর মতো ভারতও ভালোরকম আর্থিক বিনিয়োগ করেছে। এই রকম জটিল পরিস্থিতিতে কোন দেশই নিজের আর্থিক লোকসান চাইবে না। এই অবস্থায় আসিয়ান দেশ গুলো ভারতের সঙ্গে সহযোগিতা ও সম্পর্ককে আরো দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি করতে চাইছে। যার প্রমাণ আসিয়ানের বর্তমান অধ্যক্ষ তথা সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী লি সেইং লুং -র বক্তব্যের মধ্যে ফুটে ওঠে। যেখানে তিনি [২৫ জানুয়ারি, দিল্লিতে] বলেন, ভারত ও আসিয়ান মিলে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় আর্থিক ব্লক তৈরি করতে পারে এবং এটা সম্ভব।১০ বিগত দু'দশক ধরে ভারত যে ভাবে আন্তর্জাতিক স্তরে নিজেকে এক শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে তুলে ধরতে সচেষ্ট [বিভিন্ন সময়ে প্রমাণও করেছে] তা অত্যন্ত লক্ষণীয়। ইউ পি এ সরকারের পর বিশেষত এন ডি এ - ২ সরকারের আমলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দীর্ঘ ২২ বছরের LEP- র দৃষ্টিভঙ্গি কেই সম্পূর্ণ পাল্টে দিয়েছেন। ২০১৭ -র "ডাকলাম" বিবাদের সময় থেকেই ভারতের অবস্থান আরো দৃঢ়বদ্ধ। এক নতুন ভারতকে সকলে দেখল। যথাযথ প্রতি-উত্তর দিতে সে সক্ষম। ফলে এই রাষ্ট্র গুলোর কাছে ভারতের acceptance যথেষ্ট বেড়ে গেছে। যাকে কোন ভাবেই অস্বীকার করার

উপায় নেই। আর অস্বীকার করলে ভাবের ঘরে চুরি করা হবে। বর্তমানে ভারতকে এই রাষ্ট্র গুলো একটা নির্ভরযোগ্য দেশ হিসেবে দেখছে, যাকে নির্ভর করা যাবে এবং যার উপর নির্ভরশীলও হওয়া যাবে। সোজা কথায়, আসিয়ান ভারতকে দেখতে চাইছে ------ strategic partner হিসেবে, political ally হিসেবে।

ভারত-আসিয়ান পারস্পরিক নির্ভরশীলতার সাম্প্রতিক গতিপ্রকৃতি:

'বর্তমান একুশ শতক যে এশিয়ার শতক' হতে চলেছে, তা আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতি বা অর্থনীতির বিশেষজ্ঞরা এককথায় স্বীকার করেন। এবং বর্তমানে, দুটো পৃথক রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে পারস্পরিক বিশ্বাসের [সব পরিস্থিতিতে যে থাকতেই হবে, তার কোন মানে নেই] সঙ্গে আরো তিনটি বিষয় মুখ্য ভূমিকা নেয়, যথা--- ১) অর্থনীতি, ২) অর্থনীতি, এবং ৩) অর্থনীতি। আমরা মানি বা নাই মানি এটাই সত্য। সাম্প্রতিক সময়ের মার্কিন-চিন বা মার্কিন-রুশ বাণিজ্যিক সম্পর্ক বা ভারত-চিন বাণিজ্যিক সম্পর্কের দিকে তাকালেও খুব সহজে সেটা বোঝা যাবে, যেখানে অর্থনৈতিক স্বার্থ স্ব-দর্পে বিদ্যমান কিন্তু 'বিশ্বাস' আস্থাহীনতার সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে ব্যস্ত।

তবে ভারত-আসিয়ান সম্পর্কের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষই অর্থনীতি, ছাড়াও আরও সবচেয়ে বেশি করে জোর দিতে চাইছে তাদের পারস্পরিক বিশ্বাস ও সম্পর্কের উপর। যা কোথাও না কোথাও দাঁড়িয়ে আছে তাদের সাংস্কৃতিক আত্মীয়তার বন্ধনের উপর। ২০১৭-র ১৩ থেকে ১৫ নভেম্বর, ফিলিপিনস্-র মানিলাতে আসিয়ানের সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষে একত্রিশ তম শিখর সম্মেলন এবং দ্বাদশ পূর্ব এশিয়া সম্মেলন একই সাথে অনুষ্ঠিত হল। যেখানে এই নিয়ে চতুর্থ বারের মতো যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। তাঁর কথায় উঠে আসে, "... উভয়ের মধ্যে যে গভীর ও গহন সাদৃশ্য আছে, তার পক্ষেই ভারত দৃঢ়বদ্ধ ভাবে কাজ করতে চায়। কারণ, দুজনের ভবিষ্যত অনেকটাই এক। ... এই আঞ্চলিক সংগঠন শান্তি স্থাপন ও আর্থিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে দক্ষতা অর্জন করেছে এবং যে ভূমিকা প্রতিষ্ঠা করেছে, সেই প্রক্রিয়াতে ভারতও নিজেকে তাদের এক স্বাভাবিক সহযোগী ও পরিবারের সদস্য রূপে দেখে" [১৩.১১.২০১৭, রাজ্যসভা টিভির নিউজে সম্প্রচারিত]। উল্লেখ্য, এবারের সম্মেলনের মূল মন্ত্র ছিল "Partnering for Change, Engaging the World".

দীর্ঘ ২৫ বছরের যাত্রাপথে, ভারত-আসিয়ান, আর্থিক আদানপ্রদান ও সহযোগিতা, নিরাপত্তা সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি এবং হাজার হাজার বছরের সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের প্রাচীন ঐতিহ্যের ভিত্তিতে 'ক্রম-বর্ধমান' গতিতে একে অপরের কাছে এগিয়ে এসেছে। সামরিক, সড়ক, যোগাযোগ ব্যবস্থা, মুক্ত বাণিজ্যের মতো বহু বিষয়ে যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে একাধিক বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়েছে। যে গুলোকে এই লেখার মধ্যে তুলে ধরাই হল মূল উদ্দেশ্য। অন্যদিকে,২০১৮ -র জানুয়ারিতে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত 'আসিয়ান-ভারত শিখর' [commemorative] সম্মেলনে উভয় পক্ষের রাষ্ট্র নেতাদের বহুপাক্ষিক বার্তার পর ২৫ জানুয়ারি, ২০১৮,রাত ৯:২০ নাগাদ প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর [PMO] থেকে Delhi Declaration [DD] প্রকাশিত হয়। DD অনুযায়ী, উভয় পক্ষ মোট ৩৬ টা ক্ষেত্রে পরস্পর সহযোগিতার কথা বলেছেন। যে গুলো চারটে মুখ্য বিষয়ে বিভক্ত; যেমন -- ১) রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত সহযোগিতা, ২) অর্থনৈতিক সহযোগিতা, ৩) সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সহযোগিতা, এবং ৪) যোগাযোগ স্থাপন। এছাড়াও এখানে Cooperation on Narrowing the Development Gap -র বিষয়টাও উঠে এসেছে।

আর্থিক সম্পর্ক:

আসিয়ান, ভারতের চতুর্থ বৃহত্তম বাণিজ্যিক সহযোগী দেশ। ২০১৫-১৬ তে দু'পক্ষের মধ্যে ৬৫ বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য হয়, যা ২০১৬-১৭ তে বেড়ে গিয়ে ৭০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। ভারত, আসিয়ান থেকে ২০১৫-১৬ তে ২৫ বিলিয়ন ডলারের সামগ্রী আমদানি করেছে। ২০১৬-১৭ তে ভারত রপ্তানি করেছে ৩০ বিলিয়ন ডলারের সামগ্রী। ভারত, আসিয়ানের সপ্তম বৃহত্তম বাণিজ্যিক সহযোগী। ২০০০ -র পর থেকে

ভারতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আসিয়ানের যোগদান গড়ে প্রায় ১২.৫% [উক্ত তথ্য ২৫.১.২০১৮, রাজ্যসভা টিভিতে রাত ৮:৩০ এ সম্প্রচারিত 'দেশ দেশান্তর' নামক অনুষ্ঠানে তুলে ধরেন, দ্য ট্রিবিউন পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক, কে ভি প্রসাদ এবং সেন্টার ফর রিজিওনাল ট্রেড -র প্রধান ড. রাম উপেন্দ্র দাস]। উভয়ের মধ্যে বেশ কয়েকটা সহযোগী তহবিল বা কোষও তৈরি করা হয়েছে। যার মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিকাশ, কৃষি, সবুজায়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণ অন্যতম।

দিল্লির যৌথ ঘোষণাপত্র অনুযায়ী, আর্থিক সহযোগিতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সামুদ্রিক পথে যোগাযোগ ও বাণিজ্যের বিষয় এবং বিমানের মাধ্যমে যোগাযোগ বৃদ্ধির বিষয়ের উপর বিশেষ ভাবে জোর দেওয়া হয়েছে। যেখানে International Maritime Organisation, International Civil Aviation Organisation, এবং ১৯৮২ -র United Nations Conversation on the Law of the Sea বা UNCLOS -র নির্দেশ ও নিয়মকানুন'কে সবচেয়ে আগে মান্যতা দিয়েছে, উভয়পক্ষ। যাতে কোনও ভাবেই রাষ্ট্র গুলোর জলসীমা গত সার্বভৌমত্বের অবমাননা না ঘটে। DD-র বিষয় গুলোকে খুব ভালো ভাবে পড়লে বোঝা যাবে, উভয় তরফের পারস্পরিক সহযোগিতা, চাহিদা, বোঝাপড়া ও স্বার্থ যতটা এখানে প্রতিফলিত হয়েছে; ততটাই চিনের নেতিবাচক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে পরোক্ষে বিষোদগারও ব্যক্ত হয়েছে।

ভারত-ফিলিপিনস সহযোগিতা --- বিগত ৩৬ বছরে এই প্রথম কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ফিলিপিনস সফরে গেলেন। শেষবার ১৯৮১ সালে ইন্দিরা গান্ধী ফিলিপিনস-এ সরকারি সফরে গিয়েছিলেন। এই দেশটির সঙ্গে ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রথম স্থাপিত হয় ২৬ নভেম্বর, ১৯৪৯। নভেম্বরের সম্মেলনে ফিলিপিনস-এর সঙ্গে ভারতের চারটে সহযোগিতা মূলক চুক্তি হয়েছে। উভয় রাষ্ট্রই ঐক্যবদ্ধ ভাবে ঘোষণা করেছে, তাদের কাছে সবচেয়ে বড় বিপদ -- সন্ত্রাসবাদ। তাদের মূল লক্ষ্য, প্রতিরক্ষা, কৃষি ও ছোট উদ্যোগের ক্ষেত্রে পূর্ণমাত্রায় পারস্পরিক সহযোগিতাকে দ্রুত বাড়াতে থাকা। বর্তমানে ফিলিপিনস-এ এক লক্ষ কুড়ি হাজার ভারতীয় বসবাস করে। যার মধ্যে পাঁচ হাজার ভারতীয় বংশোদ্ভূত সেখানকার নাগরিকতাকে গ্রহণ করেছে। সেখানকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়তে প্রায় দশ হাজার ভারতীয় ছাত্রী উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করছে [১৩.১১.২০১৭, জি নিউজ চ্যানেল, রাত ৮:৩০, DNA]।

সালটা ১৯৮৫, মানিলা শহরের তৎকালীন মেয়র ড: রেমন্ড [যিনি নিজেই একজন ভারতীয় বংশোদ্ভূত ছিলেন] স্থাপন করলেন 'মহাবীর ফিলিপিনস ফাউন্ডেশন' নামক সংস্থাকে। ফিলিপিনস-এ এমন বহু শিশু রয়েছে যাদের 'পা' অকেজো হয়েগেছে বা হাঁটুর নীচে থেকে বাদ গেছে। ভারতের রাজস্থান থেকে প্রতি বছর, কৃত্রিম ভাবে তৈরি করা 'পা' সেখানে পাঠানো হয় এবং এই ফাউন্ডেশন সেই কৃত্রিম 'পা' গুলোকে এখানকার চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তাকে মাথায় রেখে শিশুদের অঙ্গে প্রতিস্থাপিত করে আসছে। ২০১৭ তে মোট ৭৫৭ জন শিশুর অঙ্গে এই ধরনের কৃত্রিম 'পা' প্রতিস্থাপিত করা হয়েছে, যা ভারত থেকেই রপ্তানি করা এক অন্যতম সামগ্রী [ঐ, তদেব,DNA]। মানিলা সফরে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী সেখানকার উন্নত কৃষি ব্যবস্থার প্রতিও বিশেষ ভাবে দৃষ্টি দেন। সেখানে কৃষকদের সাহায্য করার জন্য কিভাবে ড্রোনের ব্যবহার করা হচ্ছে, সেই বিষয়টাকেও তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে অনুধাবন করেছেন। যা ভারতীয় মিডিয়াতেও প্রকাশিত হয়েছে। তবে, ভবিষ্যতে এই সুবিধা ভারতের মতো এত বিশাল জনসংখ্যার সঙ্গে যুক্ত কৃষিক্ষেত্রে আদৌ প্রয়োগ করা সম্ভব হতে পারে কিনা, সে নিয়েও কিন্তু একটা চর্চার সম্ভাবনা থেকে যায়। তাছাড়া, দু'তরফের মধ্যে কী ধরণের পরিকল্পনা গ্রহণ ও রূপায়ণ হচ্ছে বা সম্পর্ক ঠিক কোন স্তরে এসে পৌঁছেছে তার একটা স্বচ্ছ আভাস পাওয়া যাবে, ফিলিপিনস-এ নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত জয়দীপ মজুমদারের জি মিডিয়া-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে।

ভারত-ইন্দোনেশিয়া সহযোগিতা:

জানুয়ারির দিল্লি সম্মেলনে ইন্দোনেশিয়ার বাণিজ্যমন্ত্রী এংগার তিয়াস্তো লুকিতা সবচেয়ে বেশি জোর দেন উভয়ের মুক্ত বাণিজ্যের উপর। তার বক্তব্যে উঠে আসে, "২০১০-এ আমাদের মধ্যে যে মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চলের অস্তিত্বটি উঠে আসে, তারপর অনেকটা সময় চলে গেছে। ... এখন মুক্ত বাণিজ্য সংক্রান্ত চুক্তিকে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে লাগু করা উচিত। ... পারস্পরিক ক্ষেত্রে যে অভ্যন্তরীণ কিছু ত্রুটি আছে, তাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দূর করা প্রয়োজন। যাতে অঞ্চলগত মুক্ত বাণিজ্যকে আরো উৎসাহ দেওয়া যায় ও বৃদ্ধি করা যায়" [২৫.১.২০১৮, নিউজ, রাজ্যসভা টিভি এবং বিজনেস স্ট্যানডার্ড] ।

ভারত-মায়ানমার সহযোগিতা:

গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে প্রধানমন্ত্রী মায়ানমার সফরে যান। যেখানে ৬ তারিখ, রাষ্ট্রপতি হিতিন কওয়াইয় এবং ক্ষমতাসীন দলের নেত্রী অং সাং সু চি-র সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। দু'দেশের মধ্যে সামরিক সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়টা মুখ্য হয়ে ওঠে। সমুদ্রপথে নিরাপত্তা বাড়ানো-সহ মোট এগারোটা চুক্তিপত্র সই হয়। মায়ানমারের নাগরিকদের ভারতে আসার জন্য ভিসা-ফি তুলে দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেন মোদী [৭.৯.২০১৭, দৈনিক জাগরণ]। আসলে আসিয়ান-ভুক্ত দেশগুলোর সঙ্গে ভারতের ভূখণ্ড গত যোগসূত্র স্থাপন করে মায়ানমার। আসিয়ান রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক স্তরে সামরিক ও বাণিজ্যিক যোগাযোগ বাড়াতে ভারত যথেষ্ট তৎপর। একটা দীর্ঘ সময় ধরে মায়ানমারের প্রাক্তন সামরিক শাসনকে চিন সাহায্য দিয়েগেছে। এখন গণতন্ত্রের শাসন সেখানে। এই সময়ের সঠিক ব্যবহার করতে হবে, না পারলে কূটনৈতিক স্তরে ভারত চিনের কাছে পিছিয়ে পড়বে। আর যে কোন দেশের পক্ষে এটা আশাব্যঞ্জক মোটেই নয়। এবং ভারত, ভালো ভাবেই জানে যে, মায়ানমারে চিনের প্রভাব কমিয়ে সেদেশের সঙ্গে আরও গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রচনা করতে না পারলে, সে কাজে সাফল্য আসবে না। এছাড়া, ভারতের AEP -কে কার্যকর করতে হলে মায়ানমারকে নিজের নিজের সহচর বানাতেই হবে।

মোদী মায়ানমার সফরে গিয়ে ঘোষণা করেন, ভারতের বিভিন্ন জেলে বন্দি সে দেশের চল্লিশজন নাগরিককে মুক্তি দেওয়া হবে [ঐ, তদেব]। বাণিজ্য, সংস্কৃতি ও নিরাপত্তা হবে উভয়ের সহযোগিতা মূলক কর্মক্ষেত্রের মূল উপাদান। এই সুযোগে এক আবেগঘন মুহূর্তে সু চি-র হাতে মোদী তুলে দেন একত্রিশ বছর আগে শিমলার 'ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব অ্যাডভান্সড স্টাডিজ'-এ জমা দেওয়া তার গবেষণাপত্রের বিশেষ প্রতিলিপি। তাছাড়া, সন্ত্রাসবাদ এবং জঙ্গি দমন এই দুটো বিষয়ও এখানে অন্যতম কারক হিসেবে কাজ করছে। কারণ, উত্তর-পূর্ব ভারতের পাঁচটা রাজ্যের সঙ্গে মায়ানমারের সীমানা যুক্ত। এই অঞ্চলের স্থানীয় বিচ্ছিন্নতাবাদী জঙ্গি সংগঠন গুলোর বিভিন্ন জঙ্গিরা সুযোগ পেলেই সীমান্ত পেরিয়ে মায়ানমারে চলে যায়। দীর্ঘদিন ধরেই ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর সঙ্গে মায়ানমারের সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর যৌথ জঙ্গি দমন প্রক্রিয়া চলে আসছে বিভিন্ন সময়ে। সেখানকার সীমান্ত রক্ষীবাহিনী ভারত থেকে পালিয়ে যাওয়া জঙ্গিদের বিরুদ্ধে এক উন্নত প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। ফলে এই জঙ্গিদেরকে সহজেই তারা গ্রেপ্তার করতে পারে এবং ভারতের হাতেও তুলে দেন। অনেক ক্ষেত্রে সেখানকার গভীর জঙ্গলে গেরিলা সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে জঙ্গিরা মারা যায়। ফলত, এক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে যে সুষ্ঠু ও গঠনমূলক বোঝাপড়া গড়ে উঠেছে তা ভবিষ্যতে উভয় পক্ষের অভ্যন্তরীণ সন্ত্রাসবাদ দমনে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে, তা সামরিক বিশেষজ্ঞরা একবাক্যে স্বীকার করেন।

ভারত সরকারের 'Make in India' প্রকল্পের ক্ষেত্রেও আসিয়ান-কে যুক্ত করা হয়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য দ্বিখণ্ডিত হওয়ার পর হায়দ্রাবাদ তেলেঙ্গানা রাজ্যের রাজধানী হিসেবে এখন পরিচিত। ফলে বর্তমান অন্ধ্রপ্রদেশের রাজধানী হচ্ছে অমরাবতী। যাকে রাজধানী হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সিঙ্গাপুর একদিকে যেমন আর্থিক বিয়োগ করছে তেমনি একই সাথে সেখানকার ডিজিটাল ইন্ডাস্ট্রিকে নতুন ভাবে রূপ দানের কাজেও ভালো মাত্রায় সাহায্য করছে। অন্যদিকে, কম্বোডিয়ার সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক আদানপ্রদান-র

অন্যতম ক্ষেত্র -- বস্ত্রশিল্প। কম্বোডিয়াতে, দু'দেশের ঐতিহ্যবাহী পোষাকের যে 'ভারত মেকং গঙ্গা আসিয়ান' মিউজিয়ামটি রয়েছে, তা সম্পূর্ণ ভারত সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত।

যোগাযোগের সেতু নির্মাণ:

২০১৭ ও ১৮-র সম্মেলনে ভারত সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দিয়েছে যোগাযোগ [connectivity] স্থাপনের উপর। নরেন্দ্র মোদী তাঁর ভাষণেই বলেন, "আমরা এতোদিন ধরে নিজেদের মধ্যে উন্নত সম্পর্ক স্থাপন করেছি। এবার আমরা আমাদেরকে সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত করতে চাই"। এই আহ্বানের প্রত্যক্ষ প্রতিফলন দেখা যায়, 'ভারত, মায়ানমার ও থাইল্যান্ডের' মধ্যে ১,৩৬০ কি.মি. দীর্ঘ ত্রিপাক্ষিক আন্তর্জাতিক সড়ক নির্মাণ প্রকল্পে। যাকে তরান্বিত করার জন্য ত্রিপাক্ষিক Motor Vehicle সমঝোতা হয়েছে। আশা করা হচ্ছে, ২০১৯-র প্রথমদিকেই এই সড়ক নির্মাণের কাজ শুরু হবে ভারতের মণিপুর থেকে। তবে ভারত চায়, এই সড়ককে লাওস ও কম্বোডিয়া হয়ে ভিয়েতনাম পর্যন্ত নিয়ে যেতে। এই রাস্তা তৈরি হলে, খুব সহজেই স্থলপথে অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এর দ্বারা উত্তর-পূর্ব ভারতের উন্নতি ও প্রগতির পথও যথেষ্ট তরান্বিত হবে। বিশেষত এখানকার কৃষিদ্রব্যের রপ্তানি বাণিজ্য উপকৃত হবে। খেয়াল রাখা দরকার, সাম্প্রতিক সময়ে কিন্ত বিজেপি তথা কেন্দ্রীয় সরকার তাদের নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে উত্তর-পূর্ব ভারতকে পাখির চোখের মতো দেখছে। কারণ, এটাতো AEP-কে রূপায়িত করার মূল করিডোর বা ট্রানজিট এরিয়া। এই অঞ্চলে ভারতের সাতটা রাজ্য অবস্থিত। যাদেরকে seven sisters বলা হয়। তবে এখন সিকিমকেও এর সঙ্গে যুক্ত করার কথা আলোচিত হচ্ছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও নানাবিধ সম্পদের পরিপূর্ণ এক অকল্পনীয় সমাহার। এককথায় সত্যি "মর্তের দেবলোক"। এই 'অষ্টলক্ষ্মীর' সার্বিক উন্নয়ন এখন দিল্লির মুখ্য priority. কারণ, পূর্বের এই দেবলোক বৃহত্তর ভারতীয় ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত একমাত্র পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমে। যোগাযোগের পথ শিলিগুড়ি করিডোর। ভারতের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে যা অন্যতম এক স্পর্শকাতর স্থান। যার চারদিকে রয়েছে নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ ও চিন অধিকৃত তিব্বতের সীমানা। ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে এলাকাটা পরিচিত 'chicken's neck' হিসেবে। শত্রু বড়ো আকারে আক্রমণ করলে, উত্তর-পূর্ব ভারতের বৃহত্তর ভারতীয় ভূখণ্ডের থেকে স্থলপথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার মতো আশঙ্কাও থাকে। ভারতের মানচিত্রে সিকিম ও শিলিগুড়ি করিডোরের এই অংশটাকে ভালভাবে দেখলে স্পষ্টতই ফুটেওঠে ' যেন একটা মুরগির মাথা'। গত এক বছরে 'ডোকলাম' বিবাদের পর থেকে এলাকটা আরো স্পর্শকাতর হয়ে উঠেছে। তাছাড়া দার্জিলিঙে বিমল গুরুংদের দ্বারা পরিচালিত বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের পেছনে বিদেশী শক্তির কতটা ইন্ধন কাজ করেছে, তা সেই সময়কার বিভিন্ন সংবাদপত্র থেকে জানা সম্ভব। যেখানে গুপ্তচর সংস্থাগুলোর গোপন প্রতিবেদনের নানা তথ্যেরও উল্লেখ রয়েছে। তাই এই করিডোরের সার্বিক নিরাপত্তার দিকটাই ভারত সরকারের সবচেয়ে বড়ো মাথা ব্যাথার কারণ।

অন্যদিকে, যোগাযোগ ও আর্থিক উন্নয়নের প্রেক্ষিতে পর্যটনের গুরুত্ব যথেষ্ট রয়েছে। ভারত ও আসিয়ান দেশগুলোর মধ্যে খুব কম খরচে অসামরিক বিমান চলাচলের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। যাতে Peoples to Peoples contact বৃদ্ধি পায়। দু'তরফের মানুষ একে অপরের দেশে আরও বেশি করে যেতে পারবে। ফলে কর্মসংস্থান ও বাজার তৈরি হওয়ার সম্ভাবনাও থাকবে। ভ্রমণ ও পর্যটন সংক্রান্ত পত্রিকাগুলো থেকে জানা যায়, মধুচন্দ্রিমা হোক বা পরিবারকে   নিয়ে নিখাদ ছুটি, বিদেশ বলতে ইদানিং ব্যাঙ্কক-পাটায়া-ই বুঝছে ভ্রমণপ্রিয় ভারতীয়দের একটা বড়ো অংশ। কারণটা অবশ্যই অতি কম খরচে বিদেশ ভ্রমণ। মাস ছয়েক আগে থেকে একটু দেখেশুনে কলকাতা থেকে ব্যাঙ্ককের প্লেনের টিকিট কাটলে খরচ পড়বে মুম্বই বা চেন্নাইয়ের চেয়েও কম। ভিসা পাওয়ার ক্ষেত্রে জটিলতাও অত্যন্ত কম। বিদেশে চাকরির জন্য এ দেশগুলোর স্থান ভারতীয় যুবসমাজের পছন্দের তালিকার অনেকটা শীর্ষে এখন।

প্রতিরক্ষার সমীকরণ ও সন্ত্রাসবাদ:

ভারত-আসিয়ান পারস্পরিক সামরিক সহযোগিতাকে নিয়ে আলোচনা করতে গেলে চিনের উপস্থিতি অবশ্যম্ভাবী। চিন সত্যি চিন্তারই কারক। তাকে মাথাতে রেখেই 'দিল্লি ঘোষণাপত্রে' নিরাপত্তা সংক্রান্ত যৌথ নীতিগুলোকে তুলেধরা হয়েছে। আর এর সমাধান চোখে চোখ রেখেই করতে হবে, চোখ নামিয়ে নয়। বিগত আট-ন' বছর ধরে দক্ষিণ চিনসাগর ও ভারত মহাসাগরে সে নিজের আধিপত্য স্থাপনকারী কর্মকাণ্ডকে রূপায়িত করতে গিয়ে এক জটিল ঘূর্ণাবর্ত তৈরি করেছে। আমরা জানি, ভারত ও আসিয়ান উভয়ের সঙ্গে চিনের বাণিজ্যিক লেনদেন আছে। আবার সন্দেহ বা আস্থাহীনতার সহাবস্থানও রয়েছে। অর্থাৎ, আর্থিক চাহিদা এবং প্রতিযোগিতা দুটোই একসঙ্গে ছুটছে। আজকের দুনিয়াতে এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। "কিন্তু চিনের আসল লক্ষ্য কী? সে ভারতকে কেবল দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে রাখতে চায়। ভারত পূর্ব এশিয়ার দিকে অগ্রসর হোক, তা চিন চায়না। Strategic Partnership তৈরি হওয়ার পর থেকে উভয় পক্ষের মধ্যে গত পাঁচ বছরে সামরিক সহযোগিতা ক্রমেই বর্ধমান। যাকে চিন সন্দেহের চোখে দেখে" [বিবেক কাটজু, প্রাক্তন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত, ২৫.১.২০১৮, রাজ্যসভা টিভির 'দেশ দেশান্তর' নামক অনুষ্ঠানে ব্যক্ত করেন]।

"আমরা প্রত্যেকেই নিজেদের দেশে নিজেদের মতো করে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি এবং এখনও করছি। কিন্তু এখন সেই সময় চলে এসেছে, যখন আমাদের প্রত্যেককে একে-অপরের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে যৌথভাবে এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। আর এর সমাধানও খুঁজে বার করতে হবে"। বক্তা, ভারতের প্রধানমন্ত্রী। আসিয়ানের রজতজয়ন্তী বর্ষ শীর্ষক সম্মেলনকে সম্বোধন করতে গিয়ে সন্ত্রাসবাদের প্রেক্ষিতে এই মত ব্যক্ত করেন। যার প্রতিধ্বনি আমরা দেখতে পাই, পূর্ব-এশিয়া সম্মেলনে গৃহীত প্রধান দলিলের মধ্যে। যেখানে চারটি মুখ্য বিষয় গৃহীত হয়েছে। যথা:
১) সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই। সন্ত্রাসবাদীরা যে সব পথ দিয়ে আর্থিক সাহায্য পায়, তাকে রোধ করতে হবে। তাদের কাজকর্মের প্রচারকেও রোধ করতে হবে। কারণ, বিভিন্ন গোষ্ঠী নানা পন্থা অবলম্বন করে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে ও সুকৌশলে সন্ত্রাসবাদীদেরকে প্রচারের আলোয় তুলেধরে।
২) আর্থিক সংস্কার।
৩) দারিদ্রের বিরুদ্ধে লড়াই।
৪) রাসায়নিক অস্ত্র নির্মূল করার ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা স্থাপন।

বিশ্ববাসীর কাছে এখন প্রধান সমস্যা -- সন্ত্রাসবাদ। যার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ লড়াই চালিয়ে যাওয়াটাই হল প্রাথমিক কাজ প্রতিটা রাষ্ট্রের। কিন্তু সেখানে যদি "good terrorism" এবং "bad terrorism"-র তত্ত্ব উঠে আসে, তখনই বিপদ। যখন কোন দেশ এক্ষেত্রে দু-মুখো নীতি অবলম্বন করে, তখনই তার সদিচ্ছাকে নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। আসিয়ানও বিশ্বের আর বাকি অঞ্চলের মতোই কট্টর সন্ত্রাসবাদের ঘেরাটোপে আটকে গেছে। সে কোন একটা বা কিছু দেশের মধ্যেও সীমাবদ্ধ বা আটকে নেই। 'স্থান-কাল-পাত্র' ভেদে নানা পন্থাকে অবলম্বন করে "নানা রূপ পরিগ্রহ করেছে"।

১২ অক্টোবর, ২০০২। ইন্দোনেশিয়ার বালি শহরের অন্যতম পর্যটনকেন্দ্র কুটা। পরপর দুটো বোমা বিস্ফোরণ। সন্ত্রাসবাদীরা চেয়েছিল ম্যাক্সিমাম ড্যামেজ। ২০২ জনের মৃত্যু, ২০৯ জন গুরুতর আহত। গত কয়েক বছরে সিঙ্গাপুরে ক্রমাগত সন্ত্রাসবাদীরা ধরা পরছে। ফিলিপিনস-এ আই এস আই এস -র লোকেরাতো কয়েকটা অঞ্চলকে কব্জা পর্যন্ত করে নিয়েছিল। মালয়েশিয়ার অবস্থা আরও সঙ্কটজনক। সেখানকার প্রায় ৯ শতাংশ জনতাতো সরাসরি 'দয়েশ বা আই এস আই এস'-কে সমর্থন জানাচ্ছে। ভারত

থেকে বহু সন্ত্রাসবাদীরা ইন্দোনেশিয়াতে পালিয়ে যাচ্ছে চোরাগোপ্তা পথে। যে বিষয় অনেক সময়ই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সেখানকার জঙ্গি সংগঠনগুলো এদেরকে আশ্রয় দিয়ে নানা ভাবে সাহায্য করে। মায়ানমারের রোহিঙ্গা মুসলমানদের একটা অংশের মধ্যে 'দয়েশ' ও 'আলকায়দার' বহু লোক ঢুকে পরেছে। যার প্রমাণ মায়ানমারের বিভিন্ন সংবাদপত্রে সেখানকার গোয়েন্দাদের দেওয়া তথ্য সহ প্রকাশিত হয়েছে। ঠিক একইভাবে ভারতের IB এবং RAW এ বিষয়ে বহু বিস্তারিত তথ্য কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টের কাছে পেশ করেছে, রোহিঙ্গা মুসলমানদের ভারতে শরণার্থী হিসেবে স্থান দেওয়া সংক্রান্ত এক মামলার প্রেক্ষিতে। আমরা কি খবর রাখি, বাংলাদেশে শরণ নেওয়া রোহিঙ্গাদের জন্য ভারত কত বস্তা চাল পাঠালো? বা মায়ানমারের রাখাইন অঞ্চলের উন্নতির জন্য যথাসাধ্য সাহায্য করতে চায় ভারত এবং সেই জন্য সেখানকার সরকারের সঙ্গে সমঝোতা করেছে ভারত। প্রতিবেশী রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত সন্ত্রাসবাদের দ্বারা ভারত কতটা ক্ষতিগ্রস্ত তা আজ সমস্ত দুনিয়া স্বীকার করেনিয়েছে। গত চার-দশক ধরে পাকিস্তানের সঙ্গে প্রক্সি ওয়ার চালিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে ভারত। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম আঞ্চলিক সংগঠন হল সার্ক। ভারত ছাড়াও এর অন্যান্য সদস্যরাও এর করালগ্রাসে আবদ্ধ। আফগানিস্তান, শ্রীলঙ্কা, ও বাংলাদেশে তথৈবচ অবস্থা। নেপাল সন্ত্রাসবাদীদের লুকিয়ে থাকার ও অন্যত্র পালিয়ে যাওয়ার একটা করিডোরে পরিণত হয়েছে। আর পাকিস্তান, জন্মাবধি সে নিজের কবর নিজেই খুঁড়ে যাচ্ছে।

অন্যদিকে, চিন্তার মূল কারণ যে, চিন সেও এর হাত থেকে রেহাই পায়নি। সাধারণত বলা হয়, চিনের সিন জিয়াং প্রদেশই মুখ্যত সন্ত্রাসবাদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু এটা কিয়দাংশে ভুল ধারণা। কুনমিং, ইউনান, সাং হাই এমনকি বেজিং শহরেও আমরা বড় বড় সন্ত্রাসবাদী হামলা দেখেছি। কুনমিং-র ঘটনাটা কম ক্ষতিকারক বা মারাত্মক ছিলনা। প্রায়শই এই ধরনের ছোট-বড় ঘটনা চিনে ঘটে। কিন্তু প্রশ্ন হল, কটার বিষয়ে আমরা জানতে পারি? মজার কথা, এতো কিছুর পরেও চিন এক্ষেত্রেও দু-মুখো নীতি অবলম্বন করছে দীর্ঘদিন ধরে। উদাহরণ স্বরূপ 'মাসুদ আজহার' কেসটি। ২০১৭, BRICS সম্মেলনে চিন স্বীকার করল 'জয়েশ-এ-মহম্মদ' একটা সন্ত্রাসবাদী সংগঠন। কিন্তু নিরাপত্তা পরিষদের সে বলছে 'মাসুদ আজহার' যে 'জয়েশ-এ-মহম্মদ' -র সংস্থাপক, সেই ব্যক্তি সন্ত্রাসবাদী নন। চমৎকার যুক্তি। স্বভাবতই প্রশ্ন আসে, যে ব্যক্তি এই সংগঠনটাকে তৈরি করল সে সন্ত্রাসবাদী হল না কিন্তু সংগঠনটা হয়েগেল, কীভাবে? নিরাপত্তা পরিষদে 'মাসুদ আজহার'-কে কুখ্যাত আতঙ্কবাদী হিসেবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার প্রক্রিয়াতে চিন দু'বার ভেটো দিয়েছে। বলা যায় এখন বিষয়টা প্রায় ড্রপড্ হয়েগেছে।

"চিনের সিনজিয়াং প্রদেশে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে যুক্ত জঙ্গিদের যে, তুর্কি সহ আরও কয়েকটা নির্দিষ্ট স্থানে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে, তা অনেকেই জানে। ... দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতে পাকিস্তান হল সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গি সংগঠনগুলোর আঁতুড়ঘর। ... চিন সবকিছু জেনেও না জানার ভান করছে। এখনই চিন-কে যে মাত্রায় জঙ্গি আক্রমণের সঙ্গে ডিল করতে হচ্ছে, এই অবস্থান বজায় রাখলে, ভবিষ্যতে আরও ভয়ংকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতেহবে চিন-কে" [বিদ্যানাথ ঝা, সম্পাদক, ডিপ্লোমেসি ইন্ডিয়া, ১৫.১১.২০১৭, লোকসভা টিভির 'ভারত-আসিয়ান' শীর্ষক এক আলোচনাতে এই মত ব্যক্ত করেন]। উক্ত অনুষ্ঠানে, ক্যাপ্টেন আলোক বনসল, নির্দেশক, ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন, এ ক্ষেত্রে চিনের ভূমিকাকে তথ্যসহ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, " সেখানকার শাসনতন্ত্র কি আদৌ ঠিকভাবে বুঝতে চাইছেন না 'ধর্মের আকর্ষণ-কে? মানুষ কি ভাবে এই আকর্ষণে আসক্ত হয়ে পড়ে? এই নেশা মানুষকে দিয়ে কি করাতে পারে আর পারে না, তা সেখানকার শাসনতন্ত্র হয়তো বুঝতে চায়না। তা নাহলে রমজান মাসে মানুষ খাবে, উপোস করতে পারবে না। ইমামদের দাড়ি রাখা যাবেনা। এই ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন না সেখানকার সরকার। এটা আগুনে ঘি ঢালার সমান"। যাকে বলে একপ্রকার খুঁচিয়ে ঘা করা।

রামকথা:

নভেম্বর, আসিয়ান ও পূর্ব-এশিয়া সম্মেলনের উদ্বোধনী মঞ্চ। সভাস্থলে উপস্থিত আমন্ত্রিত ২৬ টা দেশের রাষ্ট্রনেতারা। মঞ্চের প্রথমসারিতে তারা উপবিষ্ট। শুরু হল উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। সামনে মঞ্চস্থ হচ্ছে 'রামায়ণ'।

হয়তো এই প্রথম আধুনিক পৃথিবীতে এতবড় আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সূচনা হল রামায়ণের কাহিনী মঞ্চস্থ করে। এক ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী রইল সমগ্র বিশ্ব। আসিয়ানের দশটা রাষ্ট্রতেই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সরকারি অনুষ্ঠানে এই ভাবে রামায়ণের বিভিন্ন ঘটনা মঞ্চস্থ করা হয়। এটা সেখানকার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। ভারতে, মহাকবি বাল্মীকি সংস্কৃতে রামায়ণ লিখেছিলেন। কিন্তু প্রতিটি স্থানীয় ভাষায় পরবর্তীকালের কবিরা রামায়ণ রচনা করলেন। যেখানে নানা বৈচিত্রের, নানা ঘটনার সমাহার। ঠিক তেমনি, এই দশটা দেশেও সেখানকার স্থানীয় ভাষাতে রামায়ণ রচিত আছে। এবং এখানেও একই ভাবে ঘটনার বৈচিত্র্য। কিন্তু মূল আধার সেই আদি কবির সংস্কৃত রামায়ণ।

প্রতিবছরই আসিয়ান সম্মেলনে কোনো না কোনো দেশ তাদের দেশে রচিত রামায়ণকে মঞ্চস্থ করে। এবার ভারতের সাধারণতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে ২০ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়েছিল রামায়ণ উৎসব। যেখানে দশটা দেশের ১২০ জন কলা-কুশলী রামায়ণের বিভিন্ন কাহিনী মঞ্চস্থ করেন। এ'বছর কম্বোডিয়ার সরকার সরাসরি ভারতকে অনুরোধ করেছিলেন -- আসিয়ানের প্রায় প্রতিটা দেশই রামায়ণ মঞ্চস্থ করে। আমাদেরও সম্পূর্ণ অধিকার আছে ভারতে গিয়ে রামায়ণ মঞ্চস্থ করার। ভারত তাদের এই দাবিকে সম্মান দিয়ে স্বাগত জানায়। কারণ, সেই রামায়ণ রচনার কালথেকে আসিয়ানের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ। যার শতশত প্রমাণ কম্বোডিয়া, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়ার আনাচে-কানাচেতে ছড়িয়ে আছে। স্থাপত্য থেকে সাধারণ মানুষের মন, সর্বত্র গেঁথে আছে রামায়ণ-মহাভারতের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরন। "থাইল্যান্ডের বর্তমান চক্রী বংশীয় রাজারা আজও 'রাম' উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেন। ২০১৬ সাল পর্যন্ত সিংহাসনে ছিলেন দশম রাম। চলতি বছরের শেষের দিকেই নাকি অভিষেক হওয়ার কথা পরবর্তী রাজার। ১৭৮২ সাল থেকে এই বংশের রীতি অনুসরণ করলে একাদশ রাম উপাধি নিয়ে রাজত্ব শুরু করবেন তিনি" [১৬.৪.২০১৮, এই সময়]।

হাজার হাজার বছরেরও বেশি সময় কেটেগেছে। সেই কোন যুগে কলিঙ্গের সঙ্গে বাণিজ্য শুরু হয়েছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার। 'কালোজিরে' ছিল সেখান থেকে আমদানি করা অন্যতম মশলা। ঐতিহাসিক ভাবে ভারতীয় উপমহাদেশ সেতুর ভূমিকা পালন করেছে 'ইউরেশিয়া-পশ্চিম এশিয়া-মধ্য এশিয়ার' সঙ্গে 'দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার' মধ্যে। কলিঙ্গ যুদ্ধে বিজয়লাভের বেশকিছু সময় পরে, মগধের মহানায়ক যে অধ্যাত্মিক শান্তির বার্তা তাঁর উত্তর-প্রজন্মের মাধ্যমে সিংহল হয়ে এ-অঞ্চলে ছড়িয়ে দিলেন, তা আজ বিশ্বজুড়ে বোধীবৃক্ষের আকার নিয়েছে। একটা সময়ে যে 'কটনরুট', 'স্পাইসরুট' বা 'সিল্করুটের' অস্তিত্ব ছিল, তা ভারতের মধ্যে দিয়েই উভয়দিকে পৌঁছেযেতো। সেই যাত্রাপথের পুনর্নির্মাণ করতে চাইছে ভারতবর্ষ, নিজস্ব ভঙ্গিতে। যেখানে কোনো আধিপত্যের লেশমাত্র থাকবেনা। সুষমা স্বরাজের ভাষায়, "... এই মৈত্রী শতশত বছরের নয়, হাজার হাজার বছরের পুরোনো। যা রামায়ণ ও বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে জড়িয়ে আছে"।

References

Chalermpalanupap, Termsak. 2014. "ASEAN: Managing External Political and Security Relations." *Southeast Asian Affairs* 53-75.

Cheng, Joseph Y. S. 2001. "Sino-ASEAN Relations in the Early Twenty-first Century." *Contemporary Southeast Asia* 23 (3): 420-451.

Devare, Sudhir. 2006. *India & Southeast Asia: Towards Security Convergence.* Singapore: Institute of South East Asian Studies.

Jawli, Nandini. 2016. "South China Sea and India's Geopolitical Interests." *Indian Journal of Asian Affairs* 29 (1/2): 85-100.

Karen Stoll Farrell, Sumit Ganguly. 2016. *Heading East: Security, Trade, and Environment Between India and Southeast Asia.* New Delhi: Oxford University Press,.

Mohan, C. Raja. 2009. "India in the Emerging ASEAN Architecture: Prospects for Security Cooperation with ASEAN and Australia." In *ASEAN-India-Australia: Towards Closer Engagement in a New Asia*, by William T Tow and Chin Kin Wah, 40-57. Singapore: Institute of South East Asian Studies.

—. 2012 . *Samudra Manthan: Sino-Indian Rivalry in the Indo-Pacific.* New Delhi: Brookings Institution Press.

Pant, Harsh V. 2009. "India in the Indian Ocean: Growing Mismatch between Ambitions and Capabilities." *Pacific Affairs* 82 (2): 279-297.

Roy, Pradipta. 2015. "India's China Policy under Modi Government." *World Focus* 27-33.

Sarin, Vishal. 2016. *India-ASEAN Trade and Economic Relations.* New Delhi: New Century Publications.

তথ্যসূত্র

১) রাধারমণ চক্রবর্তী ও সুকল্পা চক্রবর্তী, সমসাময়িক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক (২০১৫), প্রগতিশীল প্রকাশক, ISBN : 81-902486-3-4

২) অনীক চট্টোপাধ্যায়, ঠাণ্ডা যুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক (আগস্ট ২০১২), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ISBN : 81-247-0574-7

৩) শ্রীময়ী ঘোষ, "আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে আঞ্চলিক সংগঠন- (আসিয়ান)", পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য ও অনিন্দ্যজ্যোতি মজুমদার (সম্পাদনা), আন্তর্জাতিক সম্পর্কের রূপরেখা (২০১২), সেতু প্রকাশন, ISBN : 978-93-80677-36-1

■ ওয়েবসাইট :

১) http://www.mea.gov.in

২) http://www.asean.sec.org

৩) https://en.m.wikipedia.org

৪) https://www.livemint.com

৫) রাজ্য সভা টিভি -- [দেশ দেশান্তর] -- You Tube -- ২৫.১.২০১৮

৬) লোকসভা টিভি -- [লোকমঞ্চ] -- You Tube -- ১৫.১১.২০১৭